ভূমিকা

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-1-1 পত্র— 'বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণ-১'-এর মডিউল-১-এর পঠিত বিষয়—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সম্পর্ক, প্রাচীন ও মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য, পরিচয় ও বিভিন্ন স্তর।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ভাষাগোষ্ঠীগুলির ভাষাবিজ্ঞান-ভিত্তিক বর্গীকরণ এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান। এখানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে কেন্তুম্ ও সতম্ গুচ্ছে বিভক্ত ক'রে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বিভিন্ন শাখার ভাষাগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে এবং তার মধ্য থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষা থেকে কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটেছিল, তার সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তর পেরিয়ে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা রূপে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ধারাপথটিকেও রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও এই আলোচনার শেষে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সময়সীমা, সাহিত্যিক নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও যথার্থ উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত', পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' (১-২), রামেশ্বর শ'এর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
ও
বারসার,
আশুতোষ কলেজ।

ভাষাতত্ত্ব ঃ ভাষার শ্রেণিবিভাগ ও ভাষাবংশ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে এবং যে সব লুপ্ত ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের স্বরূপ ও ইতিহাস আলোচনা করে ভাষাতাত্ত্বিকগণ সেগুলিকে কয়েকটি বর্গে শ্রেণিভুক্ত করেছেন। দুই বা ততোধিক ভাষার মধ্যে যদি ধ্বনিতত্ত্বে, রূপতত্ত্বে বা বাক্যগঠন-রীতিতে লক্ষণীয় সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহলে সেই সব ভাষাগুলির মধ্যে বংশগত মৌলিক সম্পর্ক অবশ্যই থাকবে। আবার এমন অনেক ভাষা আছে, যেগুলিকে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত করা সম্ভব হয় নি।

যে সমস্ত ভাষাগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ করতে পারা যায়নি সেগুলি বাদ দিয়ে পৃথিবীর অন্য সমস্ত ভাষাগুলিকে বিজ্ঞানীরা মোট ১২টি শাখায় ভাগ করেছেন।

যেমন -

১) ইন্দো-ইউরোপীয়
২) সেমিটিক - হেমিটিক
৩) দ্রাবিড় গোষ্ঠী
৪) বান্টু গোষ্ঠী
৫) তুর্ক - মোঙ্গল - মাঞ্চু
৬) ককেশিয়ান
৭) ফিন্নো - উগ্রীয়
৮) অস্ট্রিক
৯) টিবেটো-চাইনীজ বা সিনো-টিবেটান
১০) এসকিমো
১১) হাইপারবোরিয়ান
১২) আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ঃ

যে আদিম মূল ভাষা হতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল তার কোন নিদর্শন এখনো পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বাসস্থান কোথায় ছিল সে বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিদের ধারণা যে মধ্য ইউরোপই প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদি জন্মভূমি ছিল। আনুমানিক ৩০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে এই জাতি পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ এবং এশিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে এক বিরাট সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল। কালক্রমে মূল ভাষা কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের প্রাচীন শাখা দশটি --

i) কেলতিক
ii) ইতালিক
iii) জার্মানিক বা টিউটনিক
iv) গ্রীক
v) হিত্তীয়
vi) তোখারীয়
vii) বাল্‌তো-স্লাবিক
viii) আল্‌বানীয়
ix) আর্মানীয়
x) ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য

এই ভাষাগুলি আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে - ক) কেন্তুম্ (Centum), খ) সতম্ বা শতম্ (Satam)

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ক-বর্গের তিনটি শ্রেণি ছিল - পুরঃ কণ্ঠ্য বা তালব্য, পশ্চাৎকণ্ঠ্য বা কণ্ঠ্য এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য।

মূল ভাষার পুরঃ কণ্ঠ্য 'ক' (K) ধ্বনি কেলতিক, ইতালিক, জার্মানিক, গ্রীক, হিত্তীয় ও তোখারীয় শাখায় রক্ষিত হয়েছে; কিন্তু ইন্দো-ইরানীয়, বালতো-স্লাবিক, আল্‌বানীয় ও আর্মানীয় শাখায় এই 'ক' ধ্বনি 'শ'-কারে অথবা 'স'-কারে পরিণত হয়েছে।

মূল ভাষার পুরঃ কণ্ঠ্য ধ্বনির এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ করে ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের ভাষা গোষ্ঠীকে দু'টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।

যে ভাষাগুলিতে কণ্ঠ্য ধ্বনি রয়ে গিয়েছে সেই ভাষাগুলি কেন্তুম্ শাখার অন্তর্গত, আর যে ভাষাগুলিতে এই 'ক' ধ্বনি 'শ' বা 'স' হয়েছে, সেগুলি সতম্ শাখার অর্ন্তগত।

মূল ভাষার * Kmtom ('শত') শব্দের লাতিনে রূপ ছিল 'কেন্তুম্', আর আবেস্তায় ছিল 'সতম্'। এই দুইটি শব্দের উপর ভিত্তি করে দুটি শাখার নামকরণ হয়েছে।

মূল ভাষার * Kṃtom (শত বাচক শব্দ)

কেন্তুম্ শাখা	সতম্ শাখা
লাতিন - কেন্তুম্ (Centum)	সংস্কৃত - শতম্ (Śatam)
গ্রীক (হে) কাতোন্ (He - Katoń)	আবেস্তীয় - সতম্ (Satamˀ)
আইরিশ - কেত্ (Cēt)	স্লাবিক - সুতো (Sŭto)

ওয়েল্‌শ - কন্ত্‌ (Kānt)

তোখারীয় - কন্ত্‌ (Kānt)

ইংরেজি - হান্ড্রেড (Hundred)

লিথুয়ানীয় - শিম্‌তাস্‌ (Sžimtas)

রুশীয় - স্তো (Sto)

- মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখাগুলিকে একটি বংশ তালিকার সাহায্যে দেখানো হচ্ছে ঃ-

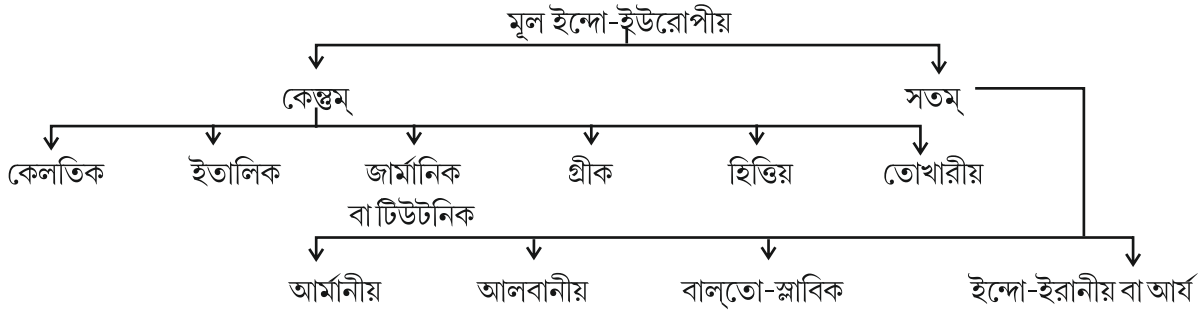

ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ঃ

ভারতীয় ও ইরানীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি অবলম্বনে যে ভাষাগুলিকে একটি শ্রেণিতে গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলিকে ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য (Aryan) বলা হয়। আর্যগণ ভারতে প্রবেশের পূর্বেই আর্যভাষা সম্ভবত তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় -- ইরানীয় আর্য (Iranian), ভারতীয় আর্য (Indic) ও দরদিক (Dardic)। এরূপ বিভাগ খ্রিস্ট-পূর্ব দুই সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

ইন্দো-ইরানীয় শাখার ভারতীয় ও ইরানীয় এই উপশাখার লোকেরা নিজেদের 'অর্য' বা 'আর্য' (= অভিজাত, noble) বলে গৌরব প্রকাশ করত, এজন্য এ শাখার অন্যতম নাম আর্য শাখা।

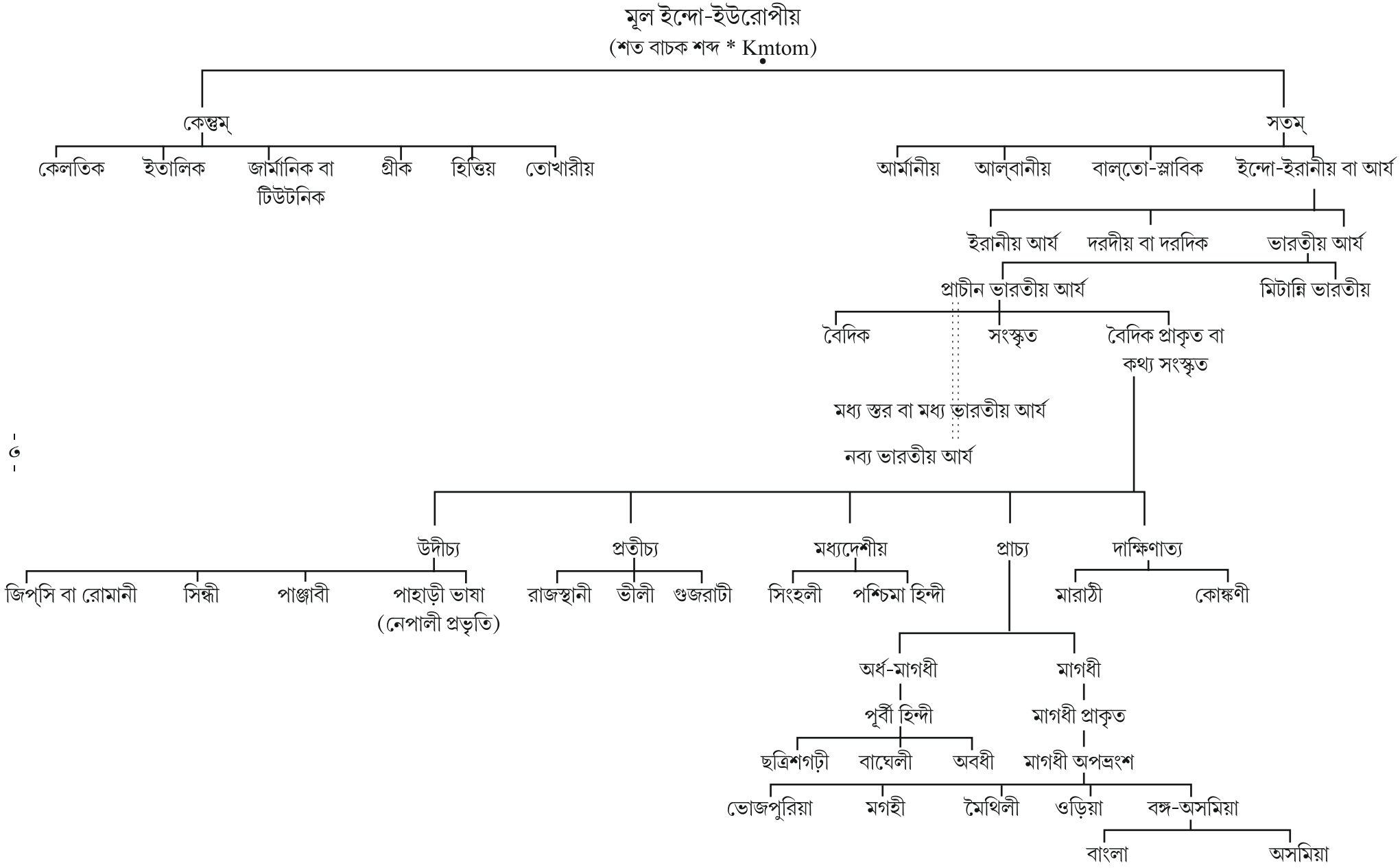
মূল ইন্দো-ইউরোপীয়
(শত বাচক শব্দ * Kmtom)
কেন্তুম্
সতম্
কেলতিক
ইতালিক
জার্মানিক বা টিউটনিক
গ্রীক
হিত্তিয়
তোখারীয়
আর্মানীয়
আল্‌বানীয়
বাল্‌তো-স্লাবিক
ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য
ইরানীয় আর্য
দরদীয় বা দরদিক
ভারতীয় আর্য
প্রাচীন ভারতীয় আর্য
মিটান্নি ভারতীয়
বৈদিক
সংস্কৃত
বৈদিক প্রাকৃত বা কথ্য সংস্কৃত
মধ্য স্তর বা মধ্য ভারতীয় আর্য
নব্য ভারতীয় আর্য
উদীচ্য
প্রতীচ্য
মধ্যদেশীয়
প্রাচ্য
দাক্ষিণাত্য
জিপ্‌সি বা রোমানী
সিন্ধী
পাঞ্জাবী
পাহাড়ী ভাষা (নেপালী প্রভৃতি)
রাজস্থানী
ভীলী
গুজরাটী
সিংহলী
পশ্চিমা হিন্দী
মারাঠী
কোঙ্কণী
অর্ধ-মাগধী
মাগধী
পূর্বী হিন্দী
মাগধী প্রাকৃত
ছত্রিশগঢ়ী
বাঘেলী
অবধী
মাগধী অপভ্রংশ
ভোজপুরিয়া
মগহী
মৈথিলী
ওড়িয়া
বঙ্গ-অসমিয়া
বাংলা
অসমিয়া

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য (Old Indo-Aryan) ভাষা

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'সতম্' গুচ্ছের একটি প্রাচীন শাখা ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) বা আর্য। ভারতীয় ও ইরানীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি অবলম্বনে যে ভাষাগুলিকে একটি শ্রেণিতে গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলিকে ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য (Aryan) ভাষা বলা হয়। আর্যগণ ভারতে প্রবেশের পূর্বেই আর্যভাষা সম্ভবত তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় – ইরানীয়-আর্য, ভারতীয়-আর্য ও দরদীয়।

আনুমানিক খ্রিস্ট-পূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে ভারতে সর্বপ্রথম আর্যদের আগমন ঘটে। তারা ইরান হতে বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হন। ক্রমে ক্রমে পূর্ব-পাঞ্জাব ও মধ্যদেশে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। প্রাগার্য জাতিসমূহকে বিতাড়িত করে আর্যদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রভাব বিস্তার করে। এবং এইভাবে আর্যাবর্তের পত্তন ঘটে। কালক্রমে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, বরেন্দ্র-কামরূপে আর্যধর্ম ও ভাষা বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণ ভারতেও আর্যধর্ম ও সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু আর্য ভাষাসমূহ দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলিকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয় নি। আর্যরা মূলত যাযাবর জাতি ছিলেন। গোপালন ও কৃষিকার্যই তাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। দেবস্তুতিমূলক বৈদিক সাহিত্য তাদের প্রধান সম্পদ ছিল। বস্তুত ভারতবর্ষে আর্যভাষী জাতিসমূহের আগমনের সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার সৃষ্টি হয়।

ভারতীয়-আর্যভাষার ইতিহাসকে তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে বিভক্ত করা হয় ঃ (ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য (Old Indo-Aryan), (খ) মধ্য ভারতীয়-আর্য (Middle Indo-Aryan), (গ) নব্য ভারতীয়-আর্য (New Indo-Aryan)।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা ঃ প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার মধ্যে পড়ে বৈদিক ও সংস্কৃত। বৈদিকযুগ তিনটি স্তরে বিভক্ত – (i) বেদ, (ii) ব্রাহ্মণ, (iii) উপনিষদ। বেদ বলতে সাধারণত চতুর্বেদ বোঝায় – ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব। ঋগ্বেদের তুলনায় অন্যান্য বেদের ভাষা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন এবং ব্যাকরণ-রীতিও অনেকটা সহজ। প্রত্যেক বেদেরই একাধিক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত। তাণ্ড্য ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদ সমবেদের অন্তর্গত। যজুর্বেদের দুটি শাখা – শুক্ল ও কৃষ্ণ। শতপথ ব্রাহ্মণ শুক্লের অন্তর্ভুক্ত। আর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের অন্তর্ভূক্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার বিভিন্ন উপস্তরগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে ঃ

i) প্রাচীন বৈদিক যুগ (Early Vedic Age)। সময় ঃ আনুমানিক ১২০০-১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। প্রধান রচনা-নিদর্শন ঃ ঋগ্বেদ সংকলন।

ii) অর্বাচীন বৈদিক যুগ (Late Vedic Age)। সময় ঃ আনুমানিক ১০০০-৮০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। প্রধান রচনা-নিদর্শন ঃ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ সংহিতা।

iii) বেদোত্তর বা প্রাক্-সংস্কৃত যুগ (Post-Vedic/Early Sanskrit Age)। সময় ঃ আনুমানিক ৮০০-৩০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ।
প্রধান রচনা-নিদর্শন ঃ ক) ব্রাহ্মণ জাতীয় গ্রন্থাবলী। সময় ঃ আনুমানিক ৮০০-৫০০ খ্রিস্ট পূর্ব
খ) বিভিন্ন আরণ্যক ও উপনিষদ। সময়ঃ আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ৭০০-৫০০
গ) সূত্রসাহিত্য বা বেদাঙ্গ জাতীয় রচনা। সময় ঃ আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ৬০০-৩০০

iv) পাণিনি নির্ধারিত সংস্কৃত (Sanskrit)। সময় ঃ আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ৫০০ –।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যিক রূপ ছিল দুটি – ক) বৈদিক সংস্কৃতের ভাষা, খ) অবৈদিক বা লৌকিক আখ্যান উপাখ্যানের ভাষা। যে আর্য-গোষ্ঠী কর্তৃক বৈদিক ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের নিবাস ছিল মধ্যদেশ। তাদের শ্রেষ্ঠ কৃষ্টির জন্য তারা উত্তর-ভারতের সর্বপ্রধান জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জাতিসমূহের মধ্যে তারা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আর্য ও অনার্য জাতির সংমিশ্রণের ফলে অনার্য ভাষা দ্বারা বৈদিক সংস্কৃতের ধ্বনি ও শব্দসমূহ বিশেষভাবে প্রভাবিত হল। আর্যগণ পশ্চিম দিক হতে যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, ততই সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগত পরিবর্তন দেখা গেল। পূর্বদেশে আর্যভাষা আদিম অনার্য জাতির অর্জিত ভাষা। সেই জন্য পূর্ব অঞ্চলে আর্য ভাষার পরিবর্তন পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বেশি হল। যখন সমগ্র আর্য-ভারতে কথ্যভাষা প্রাকৃতের রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এমন একটি ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস পেলেন যা যথাসম্ভব বেদ ও ব্রাহ্মণ সমূহের প্রাচীন উপভাষাগুলির নিকটতম হয়। মধ্যদেশ ও উদীচ্য অঞ্চলের ভাষাকে ভিত্তি করে এই নূতন ভাষার সৃষ্টি হল এবং এরই নাম সংস্কৃত (অর্থাৎ, যার সংস্কার বিধান করা হয়েছে)। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (আনু.) পাণিনি এই ভাষায় তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তিস্বরূপ 'অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ' রচনা করলেন। পাণিনির ব্যাকরণে মৌলিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষারই সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জিত রূপটি নির্ধারিত হয়েছে। উপনিষদের ভাষার পরবর্তী রূপটিই হচ্ছে পাণিনি নির্ধারিত সংস্কৃত। বৈদিক ভাষার নাম ছিল 'ছান্দস্', আর পাণিনি-সৃষ্ট সংস্কৃতের নাম হ'ল 'লৌকিক'।

অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ও সংস্কৃত সমার্থক নয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan) হলো ইন্দো-ইরানীয় ভাষার অন্যতম সন্ততি। সংস্কৃত এই প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষার একটি উপভাষা মাত্র। সংস্কৃত একটি বিশেষ যুগের একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষাভাষীরা অভিজাত গোষ্ঠী বা উচ্চকোটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই এই অভিধা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির

বিকল্প হতে পারে না। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার ব্যাপ্তিকাল ধরা হয় সাধারণত আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ১২০০-৫০০ শতক। প্রায় হাজার বছরের কালানুক্রমিক বিবর্তনে ভাষার ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়।

তৎসত্ত্বেও তার মধ্যে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায়, যার সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারা যায়। নিম্নে এই ভাষার প্রধান লক্ষণগুলো বিবৃত করা হল ঃ

i) ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ - সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং তিনটি স-কার (শ্, ষ্, স্) - সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল। যেমন –

প্রা. ভা. আ. ঋণ > ম. ভা. আ. ইন.

প্রা. ভা. আ. পিতৃনাম > ম. ভা. আ. পিতুং (পালি)

প্রা. ভা. আ. ঋষি > ম. ভা. আ. ইসি

প্রা. ভা. আ. সর্ব > ম. ভা. আ. সব্ব

প্রা. ভা. আ. শেষ > ম. ভা. আ. সেস (মাগধী শেষ)

ii) বিভিন্ন বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের দুই বা তিন বা চার বর্ণের সংযোগ হত। যেমন – হস্ত, ভক্ত, কম্প্র, ঊর্দ্ধ্ব।

iii) পদের অন্তে বিসর্গ বা হসন্তের ব্যবহার ছিল। যেমন – কনঃ, দিক্।

iv) যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার যথেষ্ট ছিল।

যেমন –

প্রা. ভা. আ.	হস্ত	>	ম. ভা. আ.	হত্থ	>	আধু. বা.	হাত।
”	পুষ্করী	>	”	পোক্খরী	>	”	পুকুর।
”	শ্রী	>	”	সিরী	>	”	ছিরি।
”	স্তব্ধ	>	”	ঠড্ঢ	>	”	ঠান্ডা।
”	ক্রীণাতি	>	”	কিণই	>	”	কিনে

v) স্বরাঘাতের (Pitch accent) স্থান-পরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তর্গতস্বরধ্বনির বিশেষ ক্রম অনুসারে গুণগত পরিবর্তন হত। স্বরধ্বনির এই পরিবর্তনের তিনটি ক্রম ছিল – গুণ, বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ। স্বরধ্বনি অবিকৃত থাকলে তাকে গুণ বলে। স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে গেলে তাকে বৃদ্ধি বলে। স্বরধ্বনি যখন ক্ষীণ হয়ে লোপ পেয়ে যায় এবং তার ফলে শব্দের অন্তর্গত এক ধ্বনির স্থানে অন্য ধ্বনি আসে, তখন সেই পরিবর্তনকে সম্প্রসারণ বলে।

vi) সন্ধির ব্যবহার ছিল, সমাসেরও যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা বলতে 'বৈদিক' এবং সংস্কৃত – উভয় ভাষাকেই বোঝায়। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করার সময় প্রথমেই লক্ষ করা যাবে – এদের পার্থক্য একদিকে যেমন কালগত (chronological), অপরদিকে তেমনি স্থানগত (Dialectal)। উভয় ভাষার কালগত ব্যবধান প্রায় হাজার বছরের। আর আঞ্চলিক ভেদ প্রধানত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্যদেশীয় অঞ্চলের। তাই উভয় ভাষার পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। এখন নিম্নে উভয় ভাষার বিশেষ পার্থক্যগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হবে ঃ

১) বৈদিক ভাষার শব্দসম্ভার অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতের চেয়েও প্রাচীন। এই জাতীয় প্রাচীন শব্দগুলির সঙ্গে আবেস্তিক শব্দের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন – বৈদিক অম 'শক্তি' (আবে. ama), বৈদিক আদ্র 'নীচ' (আবে. ādra), বৈদিক গাতু 'পথ' (আবে. gātu), বৈদিক মীঢ 'উপহার' (আবে. mizda)

২) বৈদিক সাহিত্যের সমাস-প্রকরণে কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। সংস্কৃতের মতো দীর্ঘ সমাসবন্ধন এখানে দেখা যায় না। বেদে সাধারণত দু'টি পদেরই সমাসবন্ধন ঘটে। তিনটি পদের সমাস দুর্লভ (তুলনীয় - প্রাণাপানো দানেষু)।

৩) বৈদিকের সঙ্গে সংস্কৃতের সর্বপ্রধান পার্থক্য স্বরধর্মে (Accent)। বৈদিকের স্বর স্বরসঞ্চারমূলক (Musical Accent); সংস্কৃতে সম্ভবত তা শ্বাসাঘাতমূলক (Stress Accent)। বেদে স্বরের অবস্থান শব্দার্থ এবং ব্যাকরণগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন –

র্রক্ষস্ 'রাক্ষস' (ক্লীবলিঙ্গ) কিন্তু র্রক্ষস্ 'পরিত্রাতা' (পুংলিঙ্গ)

র্ব্রহ্মণ্ 'প্রার্থনা, স্তব' (ক্লীবলিঙ্গ), কিন্তু র্ব্রহ্মণ্ 'প্রার্থনাকারী, স্তোতা' (পুংলিঙ্গ)

৪) সংস্কৃতের তুলনায় বেদের সন্ধি প্রক্রিয়া প্রাচীনতর। সন্ধির স্বাধীনতাও সেখানে যথেষ্ট এবং কথ্য ধর্মের কাছাকাছি। অনেকক্ষেত্রে ঋগ্বেদ সংহিতায় স্বরসন্ধি হলেও তারা পৃথকভাবে উচ্চারিত হত। যেমন –

হীন্দ্র = হি ইন্দ্র, তন্দ্রে = ত ইন্দ্র।

আবার, পদান্ত ম্ + য়্, ল্, র্ পরিণত হয়েছে য়ঁ, লঁ, ৱঁ-এ। যেমন – সয়ুঁধি (= সংযুধি) ইত্যাদি। লক্ষণীয়, পদান্ত ন্, বা ম্ - এর এইজাতীয় সন্ধিজাত আনুনাসিকতা সংস্কৃতে মোটেই সুলভ নয় (তুলনীয়, মহাঁল্লাভ < মহান্ + লাভঃ)।

৫) শব্দরূপে বৈদিক ভাষার প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য সংস্কৃতের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন – ধ্বনিগত বিকল্প প্রয়োগ যথা। আ-কারান্ত শব্দের কর্তৃ ও কর্মকারকের দ্বিবচনে অথবা ই-কারান্ত শব্দের অধিকরণ কারকের একবচনে – আ/ঔ (a / au) বিভক্তি – প্রিয়া/প্রিয়ৌ; শুচা / শুচৌ।

৬) বেদে কাল (Tense) সময়জ্ঞাপক ছিল না, তা ছিল বক্তানিরপেক্ষ কার্যের কাল বা রীতিবাচক। এই মানদণ্ডে তিন পর্যায়ের ক্রিয়াপদ (Verb) এবং ক্রিয়ামূল (Stem) গঠিত হত। যথা – অবিরাম কার্যকাল জ্ঞাপক লট্ পর্যায় (Present System), সদ্য কার্যকাল জ্ঞাপক লুঙ্ পর্যায় (Aorist System) এবং সম্পন্ন কার্যকাল জ্ঞাপক লিট্ পর্যায় (Perfect System)। উদাহরণ স্বরূপ – লট্ পর্যায়ের ক্রিয়ামূল গচ্ছ – (গচ্ছতি, অগচ্ছৎ, গচ্ছ, গচ্ছেৎ), লুঙ্ পর্যায়ের গম – (অগমৎ, গমঃ, গম্যাঃ) এবং লিট্ পর্যায়ের জগম – (জগম, জগাম, জগ্মিৱাংস্ ইত্যাদি)।

কিন্তু সংস্কৃতে কাল-ধারণা হয়েছে পুরোপুরি সময়জ্ঞাপক। ক্রিয়া-পর্যায়ের এত বৈচিত্র্যও সেখানে নেই।

৭) বেদে ছিল পাঁচটি 'ভাব' (Mood) ঃ নির্দেশক (Indicative), অনুজ্ঞা (Imperative), সম্ভাবক (Optative), অভিপ্রায় (Subjunctive) এবং নির্বন্ধ (Injunctive)। সংস্কৃতে অভিপ্রায় এবং নির্বন্ধ লুপ্ত।

৮) বেদে অতীতকালের আগম (যেমন, লঙ্ ও লুঙের অগচ্ছৎ, অগমৎ ইত্যাদি) বাধ্যতামূলক ছিল না। সংস্কৃতে কিন্তু এর প্রয়োগ অপরিহার্য।

৯) বেদে উপসর্গের ব্যবহার স্বাধীন। তার আচরণ ক্রিয়াবিশেষণের মতো। ফলে উপসর্গগুলি বিযুক্ত ব্যবহার বেদে যথেষ্ট সুলভ। যেমন প্র, সম্ ইত্যাদি কতকগুলি উপসর্গের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায় (প্রপ্রান্যেয়ন্তি)। সংস্কৃতে এই উপসর্গগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বদাই সমাসবদ্ধ।

১০) বেদের প্রাচীন অংশে স্বর-সংযোগ বা hiatus অসুলভ ছিল না। অনেক সময় স্বরভক্তি লক্ষণীয় (যথা, ইন্দ্র = ইন্দর, রুদ্র = রুদ্রর। কিছু ক্ষেত্রে লিখিত রূপের আসল উচ্চারণ ছিল অন্যরকম – যথা, 'পাৱক, ছর্দিঃ, পৃথিৱী, নৃণাম্, মৃল.য়' উচ্চারিত হত যথাক্রমে 'পৱাক, ছদিঃ পৃথ্বী, নৃ.ণাম্, মৃ.ল.য়' রূপে।

১১) স্বর-মধ্যগত ঘোষ মূর্ধন্যবর্ণ ড্, ঢ্, (ḍ, ḍh) ঋগ্বেদে তাড়িত ধ্বনি ল্, ল.হ (l̤, l̤h) ধ্বনিতে পরিণত হতো। যথা –

বৈদিক ঈলে. = সংস্কৃতে ঈড়ে

বৈদিক মীল্.হুষে = সংস্কৃত মীতুষে ইত্যাদি।

১২) প্রাচীন ইরানীয় ভাষার মতো ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে কেবল র্-ধ্বনি ছিল; তুলনীয় – ম্রুচ, রড্, রোম, রোহিত। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ঐ একই শব্দের ল্-এ পরিণতি দেখা যায়, যথা– ম্লুচ্, লড্, লোম, লোহিত।

১৩) ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে 'এ' এবং 'ও' ধ্বনি ছিল সম্ভবত হ্রস্ব যৌগিক স্বর অর্থাৎ তারা উচ্চারিত হত হ্রস্ব অ + ই এবং হ্রস্ব অ + উ (= ai, au) রূপে। এই উচ্চারণ সমর্থিত হয়েছে প্রাতিশাখ্যে যেখানে এদের বলা হয়েছে 'সন্ধ্যক্ষর' অর্থাৎ Sandhi Vowels। যেমন 'ত্রেধা' (tredha) উচ্চারিত হত 'এইধা' (traidha) রূপে।

১৪) বৈদিক ভাষার অনেক শব্দে-প্রযুক্ত দন্তবর্ণ পরবর্তী যুগের সংস্কৃতে মূর্ধণ্যবর্ণে পরিণত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অথবা র/ঋ-র প্রভাবে। যেমন –

ঋগ্বেদে দী 'ওড়া' > সংস্কৃত ডী (উড্ডীন)।

ঋগ্বেদে পন্ 'প্রশংসা করা' > সংস্কৃত পণ্।

ঋগ্বেদে অত্ 'ভ্রমণ করা' > সংস্কৃত অট্ (তু. অতিথি)